"নস্টালজিয়া" নামে সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫ এ আমার (আফসানা কিশোয়ার) ছয়টি গল্প সংকলিত হয়, ২০০৫ এর একুশে বইমেলায়।

গল্পক্রম

১. পরীবানুর শেষরাত্রি
২. অপারেশন ক্লিন ডিক
৩. নস্টালজিয়া
৪. মোবাতি
৫. বাতিল
৬. যেদিন গেছে...

পরীবানুর শেষ রাত্রি

পরীবানুর সকাল (তার সকাল মানে বেলা সাড়ে দশটা) থেকে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। মাসাজ করার মেয়েটা আসেনি, তার বাড়ির সামনে না কি পানি। হেয়ার ড্রেসারেরও কোন পাত্তা নেই। এই মেঘ দিনে কী কালারের শাড়ি পরা যায় - ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে তিনি তার স্বভাবসুলভ অভ্যাসে ডানগালে আঙ্গুল দিয়ে ভাবতে থাকেন।

ইতোমধ্যে সেক্রেটারি হাছন এসে বলে যায় কোথায় কখন মিটিং আছে। সেই বাইশ-তেইশ বছর আগে দুর্ঘটনায় স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর তাঁকেই সবকিছুর হাল ধরতে হয়, দুই নাবালক ছেলের দিকে তাকিয়ে। এই ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে তিনি সর্বত্র নিজের সাফল্যই দেখতে পান। আর সত্যি বলতে কী তিনি এই বিশাল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষমতাটুকু প্রতি পরতে পরতে উপভোগ করেন। তার এই কর্তৃত্বের নেশাই তাকে আজও সচল রেখেছে সুঠাম দেহবল্লরীর সাথে তা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন।

তাঁর সন্তানেরা বড় হয়েছে, বিয়ে থা করে থিতুও হয়েছে। বড় ছেলে বাবার শঠ বুদ্ধির অনেকটাই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। পরীবানুকে মানেও কম। তাই সময় থাকতেই তাকে 'কার্তুজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ' করে দিয়েছেন। আলাদা করে দিয়েছেন তার ব্যবসাদি। যদিও তিনি জানেন তুরানের পুরো লোভটাই বাবার পুরনো প্রতিষ্ঠানের উপর। তথাপি পরীবানুর নিজের জীবদ্দশায় তা হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ছোটছেলে একেবারে গোল্লায় যাওয়া যাকে বলে তাই গিয়েছে। ওর মাথায় সারাক্ষণ নেশার সাদা গাড়ি। ইদানীং আমানের দিকে তাকাতেও পরীবানুর ঘেন্না হয়। আমান - তুরানের বাবার কিছুই পায়নি। অবশ্য পরীবানু ভালো করেই জানেন পাবার কথাও নয়।

নিজেই বুঝছেন না তার আজ কি হয়েছে! কেন এমন ভূতের মতো পেছনে হাঁটছেন স্মৃতির শিরদাঁড়া ধরে। আসলেই বয়স হয়ে গেলো। যদি অমর হওয়া যেতো! তিনি সারাজীবন নিজেকে ভালোবেসেছেন প্রবলভাবে, তাই বেদনাবোধ কোন পূর্বের কাজকে ঘিরে তাঁর খুবই কম। নিজের আনন্দ বুঝে নেয়াকে কেউ যদি স্বেচ্ছাচারিতা বলে তবে তিনি তাই হতে চেয়েছেন বরাবর। আমানের জন্ম তেমনই এক অনন্দলাভের ক্ষণে।

তখন তুরানের বাবা জাকারিয়া সাহেব ছোটখাটো ব্যবসায়ী। ব্যবসা দাঁড় করাতে এদিক সেদিক তাকে ছুটতে হয় প্রায়ই। সংসারের দিকে, পরীবানু বা তুরানের দিকে নজর দেবার তেমন সময় জাকারিয়া করে উঠতে পারেননা সপ্তাহান্তেও। এর মাঝে জাকারিয়ার বন্ধু জাভেদ পরীবানুর নিঃসঙ্গ সময়ের অনেকটাই ভরে দিতে থাকেন। জাভেদ যে কোন আব্দারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন পরীবানুর কাছে। এ যেন জাকারিয়ার শূন্যস্থান পূরণ। তেমনি এক দুর্বল মুহূর্তে আমানের জন্মশয্যা রচিত হয়।

পরী বানু মনে মনে হাসেন। জাকারিযা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমানের পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছেন কিন্তু প্রমাণ করতে পারেননি কিছুই। পরীবানুর শ্বশুর মশাই কঠোর হাতে ছেলের সব সন্দেহের মূল উৎপাটন করেন। পরী বানু আজও বিশ্বাস করেন 'জাভেদ' সে সময়ের দাবি ছিল এবং নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। অবদমন অসুস্থতার লক্ষণ, তা অতিক্রম করে তিনি জাভেদের সাময়িক ভালোবাসাকে গ্রহণ করেছেন এ তার মানসিক সাফল্য- এভাবেই তিনি তাঁর অতীতকে দেখেন।

পাপবোধ নয়, আত্মতৃপ্তি- এ গুণ তিনি তার মা'র কাছ থেকে পেয়েছেন। 'মা', মায়ের কথা মনে হতেই পরী বানু'র স্মরণে আসে তফুরুন বেগম মানে তার মায়ের ডায়াবেটিকসের যে ওষুধটা দেশের বাইরে থেকে আসে তা শেষের পথে। কাল রাতে মনে হয় দু-পেগের বেশি খেয়েছেন তাই ঘাড়ে কিঞ্চিৎ ব্যথা। পরিমিত মদ্যপান শরীর সতেজ রেখে রাতের ঘুমকে গাঢ় করে এ-ও তিনি শিখেছেন তফুরুন বেগমের কাছ থেকেই। পঁচাশিতেও তফুরুন বেগম ষাটের মতোই তরতাজা।

ভাবনা ছিন্ন করে পরীবানু বাইরের দিকে তাকান। দারুণ মেঘ এখনো আকাশের গায়ে ঝুলে আছে। বেরোবার ইচ্ছেটাই তাঁর উবে যায়। নিজের ইচ্ছের মূল্য দেয়া উচিৎ সবকিছুর আগে। থাক, আজ আর বেরুবো না - 'নিজের ইচ্ছে' এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা মনে হতেই তিনি মাকে মনে মনে আবার সাবাশ দেন। ভাবেন তফুরুন বেগমের অসম সাহসের কথা। সেই সাথে পুরনো পুলক আবারও অনুভব করেন।

পরী বানু এবং তার ছোট ভাইটার গায়ের রং সাহেবদের মতো। উচ্চতা ঈর্ষণীয়। সাতচল্লিশের পরে এপারে এসে তিনি এবং তাঁর ভাই ঘরে-বাইরে মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছেন শারীরিক গড়নের কারণে। নিজের বাবার গড়পড়তা উচ্চতা, শ্যামবর্ণ প্রভৃতিতে পরীবানু নিজেও নিজেকে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনও ভেবেছেন (বাচ্চারা যা ভাবে সচরাচর) তাঁরা বুঝি কুড়িয়ে পাওয়া শিশু। বড় হতে হতে বাবা-মা'র তুমুল বিতন্ডার জের ধরে পরীবানুর জানা হয়ে যায় তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের জন্মরহস্য।

পরী বানু'র বাবা পেয়ার মজুমদার ইংরেজের অফিসে কেরানি ছিলেন। সেখানকার বড় সাহেব ফিলিপের সাথে তার দহরম মহরম একটু বেশিই ছিল। বিভিন্ন উপলক্ষে পেয়ার সাহেবের বাসায় ফিলিপের আগমন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এভাবেই তফুরুন বেগমের অন্দরে ফিলিপের মৌরসিপাট্টা গড়ে উঠলো। চাকুরী- প্রাণ দুটোই বাঁচাতে পেয়ার মজুমদার স্ত্রীর অভিসার মেনে নেন বিনা প্রতিবাদে।

পেয়ার মজুমদার সত্যিকার অর্থেই তার স্ত্রীকে পেয়ার করেছেন। কারণ ফিলিপের দু'সন্তানকেও তিনি তার নিজের মেয়ের সাথে প্রতিপালন করেন। স্ত্রীর প্রতি এই অনুরাগ বহু জায়গায় তাকে বিদ্রুপের বাণে বিদ্ধ করেছে । কিন্তু তিনি বিতাড়িত করেননি পদস্খলিত বউকে। দেশভাগের পর ফিলিপ ফিরে যান তাঁর দেশে। পেয়ার মজুমদার নিজের ঔরসজাত বড় মেয়ে আর ফিলিপের উপহার পরীবানু, ছেলে শাহজাদাসহ পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন তফুরুন বেগমের হাত ধরে।

পিতৃপরিচয়ের এই অভিনবত্ব নিয়ে পরীবানুর মনে কোন আবেগ খেলা করে না। তিনি জানেন তার এই দৈহিক কাঠামো না থাকলে কখনোই জাকারিয়ারা তাঁদের সাথে সম্বন্ধ করতেন না। জাকারিয়া তাঁর রূপের আগুনে পুড়েছে বারবার কিন্তু করতে পারেননি কিছুই। তফুরুন বেগমের 'জীবন হলো উপভোগের' - এ কথাটা পরীবানু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ভাবনায় ছেদ পড়ে হাছনের ফোনে। "ম্যাডাম, ছোট সাহেব ফকাকে তুলে এনেছে। এখন কি করবো?"

'যাই করুক, যেন মেরে না ফেলে বলে দাও'- পরী বানু অসীম বিরক্তিতে ফোন নামান।

ফখরুদ্দিন এ শহরের সবচাইতে বড় হেরোইন সরবরাহকারী। আমান হেরোইন আসক্ত। তার ধারণা বিপুল পরিমাণ ভেজাল আজকাল হেরোইনে দেয়া হচ্ছে তাই তার নেশা জমছে না। সুতরাং সে ফখরুদ্দিন ওরফে "ফইক্কা হিরু"কে তুলে নিয়ে এসেছে।

"ম্যাডাম, ফকা ভেজাল না দেবার শর্তে কান ধরে ওঠ-বস করার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে"। হাছনের এ কথার পর পরীবানু আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে এলিয়ে দেন ইজি চেয়ারে।

দু'মাস পর তাঁর একটা বড় কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা। সেটা পেলে এবার ধীরে ধীরে জে.পি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রীজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন পরীবানু, আজীবন ক্ষমতায় থাকার ভাবনাটা তাকে আজ কেন যেন অশান্তিতে ফেলে দিচ্ছে। কন্ট্রাক্ট পাবার পথে একমাত্র বাধা "সোনার বাংলা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রীজ"। তিনি ভাবেন ভালো করে কোমর বেঁধে নামতে হবে যেন কাজটা পান। তৈরী হতে হবে খুব করে।

বহুদিন পর পরীবানু আজ আবার আতঙ্কিত। "সোনার বাংলা"র মূল অফিস কে বা কারা পুড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে তুরানের বাসায় মদের নহর বইছে। তুরানের ডান হাত সালেহর মুখে পরীবানু একটা বাক্য শুনেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন- "বস্, প্ল্যানটা জব্বর হইছে। টেন্ডারে আর যোগ দেওন লাগবো না। 'সোনার বাংলা' পুইড়া কয়লা বাংলা হইয়া গ্যাছে।"

তুরান এমন কাজ কেন করলো? তিনি তো কিছু বলেননি। পরীবানু তুরানকে ডেকে পাঠান। 'আম্মা, আপনি সবকিছুতে এত নাক গলাবেন না। আমাকে আমার মতো করে কাজ করতে দেন। এই কন্ট্রাক্টের সাব কন্ট্রাক্টে আমি কাজ করবো। এবার দেশের বাইরে অ্যাসেট করতে হবে। সেজন্যে প্রচুর টাকা দরকার। আম্মা আপনি এবার বিশ্রাম নেন।"- বলেই তুরান বের হয়ে যায়।

বিশ্রাম তো তিনি নিতেই চান। কিন্তু এতটা সহিংসতায় তার মন সায় দেয় না। 'কলের কাজ কৌশলে করা' এটাকেই তিনি তার কর্ম জীবনে দর্শন মেনেছেন। শুধু শুধু শত্রু বাড়ানোতে তিনি বিশ্বাসী নন।

এরা অল্পবয়সের ছেলে। এদের আইডিওলজি-ই আলাদা। সে সাথে সালেহর মতো লোক পরামর্শদাতা হলে তো কথাই নেই। পরী বানুর কেমন যেন শীত শীত লাগে হঠাৎ এসির বাতাসে।

"আম্মা আপনাকে তো বললাম জে.পি আর কার্তুজ মার্জ করে দেন। আমানকে হিসাবের বাইরে রাখেন। আমি ওর টেক কেয়ার করবো। আপনি এবার আমাকে একটু সুযোগ দেন।"

গত একমাস ধরে তুরানের এই একই কথা। ইতিমধ্যে "সোনার বাংলা"র ভাইস চেয়ারম্যানকে কে বা কারা খুন করেছে। পরীবানুর ঘোরতর বিশ্বাস সালেহর কাজ। সালেহকে এবার ধরিয়ে দিতে হবে। তুরানকে ঠেকানোর এই একমাত্র পথ।

সালেহ কিভাবে পরী বানু'র মনের কথা টের পেয়েছিল কে জানে, কী সেই অলৌকিক ক্ষমতা! পরীবানুর বেডরুমে সালেহ সাইলেন্সর লাগানো পিস্তল হাতে দাঁড়ানো। 'আপনাকে না সরালে বড় স্যারের কোন চান্সই নাই। তাই এই সিদ্ধান্ত। আম্মাজান আপনি ইতিহাস হইতে যাইতেছেন - ছেলের সাগরেদের হাতে মা খুন । হাহ্ হাহ্.."

সালেহর হাসি রাতের আঁধারের চাইতেও বেশি কালো মনে হয় পরীবানুর কাছে। তার ভাড়াটে খুনীর হাতে জাকারিয়ার মৃত্যু মুহূর্ত কেমন ছিল তা বুঝতে থাকেন প্রতি সেকেন্ডে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন পিস্তলের মাজলের দিকে। রাতের শেষ প্রহর হাস্নাহেনা আর বারুদের মিলিত সুবাসে শিউরে উঠে থেকে থেকে।

অপারেশন ক্লিন ডিক

অক্টোবর ৯, ২০০১

দিনটা কেমন জলে গেলো। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছতেই দেড় ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো। প্রথম ক্লাশটা মিস। চারুকলাটা এত দূর! জবার কাছ থেকে ক্লাশের পড়াটা দেখতে হলো। এতকিছুর মধ্যেও মনটা সামান্য ভালো। কারণ 'তামীম' আমাকে 'হ্যাঁ' বলেছে গতকাল।
বাসায় বলে কোন লাভ হয়নি। দারা, জলিল এখনো গলির মোড়ে নিত্য টহল দিচ্ছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি দ্বিগুণ হয় বাসায় ফেরার পথে এদের অত্যাচারে। জীবন মানেই কি নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম!
-সিমরু, রাত ১২:৪৫

অক্টোবর ২১, ২০০১

আঁকা শেখানোর একটা টিউশনি পেয়েছি লালমাটিয়ায়। পাঁচটার পরে, সপ্তাহে তিনদিন। সাড়ে তিন হাজার দিবে। দুটো ফুটফুটে বাচ্চা। কলেজের খরচটা দেয়া এবার সহজ হবে। রঙের যা দাম, নিজের আঁকাতেই অনেক টাকা লেগে যায়। 'তামীম' এর সাথে একটা ডিজাইনের কাজও করছি। আমাদের বাচ্চাগুলো আমার মতো 'মা কালী' হবে না, তামীমের দিকে তাকালে লজ্জায় আমি তাই ভাবি। তামীমের হাতটা মেয়েদের মতো কি নরম...
-সিমরু রাত ১১:১৫

নভেম্বর ১৫, ২০০১

কান্না পাচ্ছে না বরং ভীষণ রাগ হচ্ছে। দারা আজকে আমার ওড়না ধরে টান দিয়েছে। আমি ওর ডান গালে একটা চড় দিয়েছি। আমার অপরাধ রাত নয়টায় খিলগাঁওয়ের মতো এলাকায় একা একা বাড়ি ফেরা। এক জবা ছাড়া আর কাউকেই আমি এই বিদঘুটে সমস্যার কথা বলতে পারছি না। দারা, জলিলরা বলেছে আমাকে দেখে নেবে। ওরা সোহান, মানে আমার ছোট ভাইকে বেধড়ক পিটিয়েছে কয়েকদিন আগে। সিফাত আপুকেও যা তা বলেছে। বাবা তার ভঙ্গুর প্রেস নিয়ে এমনিতেই জেরবার। বাসার সবাই বলছে আমাকে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে। কিভাবে মেটাবো এই সমস্যা!

- সিমরু, রাত ১:২৩

ডিসেম্বর ২, ২০০১

কোনভাবেই পারছি না কোন অন্তে পৌঁছতে। আমার না কি ঐ হারামজাদা বেজন্মাগুলোর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে! আমার বাড়ির মানুষরাও তাই মেনে নিয়েছে। মা, মা গো...কেন জন্ম দিয়েছিলে এই সম্মানহীন বেঁচে থাকা টেনে নিতে ! তুমিও সবার মতোই বললে। তাহলে আর কে বুঝবে আমার কষ্ট এই পৃথিবীতে!
-সিমরু, ভোররাত ৪:৩০

এখানেই ডায়রীটা শেষ। তামীম এ ক'টা পৃষ্ঠা এই পর্যন্তহাজারবার পড়েছে। সিমরু, কেন তুমি একবারের জন্যও আমাকে কিছু বললে না! এভাবে কি কেউ চলে যায়, না চলে যেতে হয়! আত্মহত্যা, না হত্যা? হত্যা, হত্যা, হত্যা। কী করবে তামীম? ওর কি করা উচিৎ? নিজের দিকে তাকাতে বিবমিষা হয়। পুরুষ জন্মের প্রতি ধিক্কার জন্মে। সব অসহ্য, স্রেফ অ-স-হ্য লাগে।

'সিমরুর বন্ধুরা আন্দোলনে'। তামীম পেপারে নিউজ পড়ে, ছবি দেখে। কলামের পর কলাম। আহ্! এতোকিছু যদি সিমরু বেঁচে থাকতে একদিনের জন্যও হতো! তামীমের কান্না মেশানো বিকৃত হাসিতে যে কারও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

'দারা, জলিলকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। আসামিরা আবার সিমরুর পরিবারকে হুমকি প্রদান করছে।'- উত্যক্ত করলে কি মৃত্যুদন্ড হয়?- হয় না। হুমকি তো দেবেই, তামীম মনে মনে ভাবে।

তামীমের যা অবস্থা তাতে তাকে বাসা থেকে বের হতে দেবার কোন কারণ নেই। তামীম সারাদিন বাসায় থাকে, পত্রিকা পড়ে। পত্রিকাওয়ালারা এক খবরকে আর কতোদিন গুরুত্ব দেবে! সময়ের স্বাভাবিকতায় একসময় সিমরুর ছবি পেছনের পাতায় স্থান করে নেয় । তারপর গায়েব হয়ে যায় আরো নতুন খবরের ভিড়ে- "বখাটেদের অত্যাচারে ফাহিমার আত্মহত্যা। গণধর্ষণের পর হত্যা করা হলো মহিমাকে। আমার একমাত্র বোন রুমিকে ফিরিয়ে দিন আমার বুকে- খুলনায় রুমির ভাইয়ের আহাজারি। পূর্ণিমা

ঢেকে গেল লঘুচাপের মেঘে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সমপ্রদায় তথা হিন্দুদের শায়েস্তা করার মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ধর্ষণকে...” ইত্যাকার খবরে আরও বেশি অপ্রকৃতিস্থ হতে থাকে তামীম।

অক্টোবর ৯, ২০০৪

সিমরু, আজকে ২০০৪ সালের ৯ই অক্টোবর। শনিবার। বহুদিনের চিকিৎসার পর ডাক্তাররা আমাকে দু'দিন আগে রিলিজ দিয়েছেন। আমি আমার পরিবারের কাছে আবার ফিরে এসেছি। সিমলা জায়গাটা সুন্দর। কিন্তু একজন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষের কাছে সুন্দর অসুন্দর জায়গা তেমন কোন অর্থ বহন করে না। হাসপাতালটা পাহাড়ের উপর দুর্দান্ত ছিল। জীবন থেকে তিনটা বছর চলে গেছে কিন্তু তুমি একটুও ফিকে হওনি। দেশটার এতোটুকু পরিবর্তন হয়নি। ইন্টারনেটে পত্রিকা খুলে আমি দেখেছি নওগাঁয় সেলিনা নামের এক স্কুল শিক্ষিকা বখাটেদের যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছেন। যে দেশে দশ টাকার বিনিময়ে খোলা বাজারে এসিড পাওয়া যায় সে দেশে আর কী হবে? এখনো ধর্ষিতাকে প্রমাণ করতে হয় সে যে সত্যিই ধর্ষিত হয়েছে কি না। গার্মেন্টস কর্মী রাহেলাকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি ধর্ষক লিটন ও তার সহযোগীরা, কেটে দিয়েছে হাত পায়ের রগ, এসিডে পুড়িয়ে দিয়েছে শরীর। সিমরু, বলো তো কেন আমরা এখনো বলাৎকারে- নারী নির্যাতনে জাতীয়- আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি না! তোমার মনে হয় না পাওয়া উচিৎ! আমি এখনো গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারি না। দেশে ফিরেই লুকিয়ে যে খবর দেখলাম টিভিতে তাতে বলা হলো ঢাকার শ্যামপুরে আঁখি নামের পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর বটি দিয়ে জবাই করেছে ধর্ষণকারী। আমাকে আম্মা যে কোন খবর, নিউজ পেপার এসব থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখেন। তাই অনেককিছুই থাকে আমার অগোচরে। সিমরু, আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো। বিশ্বাস করো। তোমার স্টাইলে ডায়রী লিখলাম। দেখ তো হয়েছে কি না!

-তামীম , রাত ১০:৪৫ (আমাকে এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হয়, ডাক্তারের নির্দেশ)

৭ই মার্চ, ২০০৫

বঙ্গবন্ধু এ দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ লোকের সামনে ঘোষণা করেছিলেন। আমি অখ্যাত, গ্রাজুয়েশনের সিঁড়ি না ডিঙ্গানো এক ছাব্বিশ বছরের যুবক। আজকে আমার অন্যধরনের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি সিমরু তোমার নামে। তুমি শুধু জেনে রাখো- আমি পয়েন্ট থ্রি টু একটা পিস্তল কিনেছি, ত্রিশটা গুলিসহ। কালা জসিম ভাইয়ের কাছ থেকে কয়েকদিন তালিমও নিয়েছি যন্ত্রটা চালানোর। চারমাস লেগেছে এই ছোট্ট জিনিসটা জোগাড় করতে। এখন আর কোন দ্বিধা নেই। শীতল স্পর্শ আত্মবিশ্বাসের পারদ বাড়িয়ে দিচ্ছে চড়চড় করে।
-তামীম, ১০:৩০ (রাত)

তামীম খবরটা পড়ে হাসে, তৃপ্তির হাসি। ২৬শে মার্চ, দৈনিক সমবার্তার খবর :

খিলগাঁওয়ে দু'যুবক খুন : নিজস্ব প্রতিবেদক
আমাদের খিলগাঁও প্রতিনিধি জানাচ্ছেন ২৫শে মার্চ রাত ৩টায় খিলগাঁও ফ্লাইওভারের কাছে দু-যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের ডাক নাম জানা গিয়েছে- দারা ও জলিল। পুরিশের ভাষ্যমতে তাদেরকে দু'উরুর সংযোগস্থলে ও মাথায় গুলি করে মারা হয়েছে। খুনের কোন মোটিভ এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি।

রুমির ভাই এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তবে ও জানে এভাবে বাঁচতে পারবে না। ধরা পড়তেই হবে। তামীম ওর নিজের মিশনের নাম দিয়েছে “অপারেশন ক্লিন ডিক”। যে সব শব্দ ও কোনদিন উচ্চারণ করেনি আজ সেসব শব্দই ওকে শান্তি দেয়। 'ডিক', ইংরেজী ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত এই স্ল্যাংটির প্রতি এখন ওর সকল মনোযোগ নিবদ্ধ। পুরুষের জননাঙ্গকে কত বিচিত্র নামেই না অভিহিত করা!

“পুলিশ খুলনায় রুমি আত্মহত্যা মামলায় অভিযুক্ত তিন আসামীর লাশ বয়রা এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে। আসামীরা বর্তমানে জামিনে বাইরে ছিল। ঢাকার দারা, জলিল খুনের মতোই নিহতদের দু'উরুর মাঝখানে ও মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।”- সাপ্তাহিক খুলনার ডাক, ১০ই এপ্রিল ২০০৫.

একের পর এক এ ধরনের রহস্যজনক হত্যায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। “মৃত ব্যক্তি বখাটে, সন্ত্রাসী যেই হোক তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।” - রাজশাহীতে মহিমা গণধর্ষণ ও হত্যার এজাহারভুক্ত চার মূল আসামী অজ্ঞাত পরিচয় খুনীর হাতে নিহত হবার প্রেক্ষিতে ৩০শে এপ্রিল এফটিভিকে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রী এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

“পুলিশ গত ৫ই মে এফ রহমান হল থেকে কালা জসিম নামে এক ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের সন্দেহ কালা জসিম ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী তে সংঘটিত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত। তাকে রিমান্ডে আনা হলে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে বলে পুলিশের ধারণা। তাই পুলিশ বিজ্ঞ আদালতের কাছে ৭দিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়।”-
দৈনিক ঢাকা, ১১ই মে, ২০০৫

“খুনের রহস্য উদঘাটিত না হলেও কালা জসিমকে গ্রেপ্তারের পর হতে গত তিনমাস মাথায় এবং জননাঙ্গে গুলি করে আর কোন হত্যার খবর পাওয়া যায়নি। বখাটেদের মনে স্বস্তির বাতাস। এখানে উল্লেখ্য মার্চ ২০০৫ হতে বখাটেদের উৎপাত যেমন হ্রাস পেয়েছে , তেমনি নারী নির্যাতনের খবরও এসেছে তুলনামূলকভাবে কম।”- সাপ্তাহিক সিনেচিন্তা

“পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণা জেলায় গত ১৫ই আগস্ট এগারো বছরের বালিকা মৌমিতা ধর্ষণ ও হত্যার আসামী গৌরাঙ্গ কে বা কারা পুরুষাঙ্গ কর্তন ও জবাই করে হত্যা করেছে।” -তারা বাংলা নিউজ

মোমবাতি

অনুশোচনা আছে। নিজের প্রতি একধরনের চোরাগোপ্তা বিতৃষ্ণা ও টের পাই। কিন্তু আমার কী করার ছিল? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমি নিজেকে বারবার খুঁড়েও পাইনি। তারপর নিজেই নিজেকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি -মোটের উপর যা করেছি তা শুধু আত্মসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার দায়ে, এর বেশি কিছু নয়।

নারী- পুরুষের সমতা বলে যারা চিৎকার করে তাদের আমার 'জিজ্ঞাসিব জনে জনে'র মতো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আপনার মেয়ে সন্তান ক'জন? তাদের প্রতি আপনার আচরণে কি সমতা রাখতে পারেন? একমাত্র ছেলের অনলে জগৎ পুড়ে যাচ্ছে। বাতি, বাতি, বংশের বাতি। আমি মোমবাতি, কেবল পুড়ে গলে যাওয়া যার নিয়তি।

খুব সাধারণ একটা গল্প আমার। দারুণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। বাবা মধ্যপ্রাচ্যে থাকে। এক ছেলে, তিন মেয়ে। ভাই বাইশ, আমি বিশ, আমার পরের বোন সতের, সবচাইতে ছোট বোন তের বছরের। একমাত্র ছেলে, বড় সন্তান। আমাদের তিন বোনকে এটাই বোঝানো হয়েছে। ভাইয়ার সবকিছুতে দাবি বেশী। আমরা সেভাবেই বুঝেছি। ভাইয়া যেন তেন ফার্স্ট ডিভিশন এস.এস.সি -তে। মা'র সাফাই, 'আমার সোহান পড়লে স্ট্যান্ড করতো। ও তো গান বাজনা নিয়াই থাকে।' ভাইয়া তবলায় বোল বাঁধে 'ধা ধি না, না থুন না'- আমরা তিন বোন পর্দার আড়ালে শুনি। ভাই সিগারেট খায়। মা হাত খরচের টাকা বাড়িয়ে দেন যেন টাকার অভাবে বাজে সিগারেট না খায়। আমি ব্যাচে ইংরেজী প্রাইভেট পড়তে চাইলে 'টাকা নাই।'
-মা, বীণারে একটা গানের স্কুলে ভর্তি কইরা দাও। কি সুন্দর গলা ওর!
-আগে ঠিক কইরা লেখা পড়া করুক। এইটে তো বৃত্তি পাইলো না। পাশের বাড়ির কেয়া ঠিকই পাইলো।

বলতে পারি না বেয়াদবির ভয়ে যে কেয়ার চারজন টিউটর ছিল বাসায় বৃত্তি নামক বৈতরণী পার হবার জন্যে।

ভাইয়া স্প্যানিশ গীটার কিনেছে। সারাদিন ফার্স্ট লেসন 'আবার এলো যে সন্ধ্যা'র কর্ড বাজছে তো বাজছেই। সাথে এন্তার বন্ধু বান্ধব। ঘরের মধ্যে ছেলের আড্ডা দিতে কষ্ট হয়। মা ছাদে রুম করে দেন। আমরা তিন বোন একরুমে থাকি। রিনা, দিনা, বীণা। একমাত্র বংশের বাতির জন্যে, তার বন্ধুদের জন্যে বিকাল হলেই নাশতা বানানো শুরু করি। হরেক রকমের মেয়েরাও আসে। দিনাকে মা মেরে পাট করে দেন কোচিং-এর এক ছেলের সাথে ফোনে কথা বলার অপরাধে। এইচ.এস.সি সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে আমার বাবা-মা'র আদরের সোহান কোথাও চান্স পেলো না। আকণ্ঠ মদ গিলে একরাতে রাস্তায় পড়ে থাকলে মা তুলে আনেন।
-আহারে আমার যাদু সোনা কোথাও চান্স না পাইয়া মনে বড় ব্যথা পাইছে। ছেলের মদ্যপানের সাফাই গান অন্ধ মা।
বাবা থাকেন টাকার মেশিন হিসেবে তেলের দেশে।

-আম্মা আমি ইন্ডিয়া যাব বিবিএ পড়তে। ভাইয়া একদিন বলে।

-আল্লাহ আমার পোলারে সুমতি দিছে। পড়ালেখায় মন ফিরাইছে। মা আনন্দাশ্রু তে জায়নামায ভাসান।

ভাই চলে যায় মাদ্রাজ। দু-এক মাস পরপর পাঁচশ -ছয়শ ডলার চেয়ে পাঠায়। কোথায় লাগে এতোটাকা কে জানে! আমিও তো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমার বন্ধু ব্যাঙ্গালোরে পড়ে। ওর তো এত টাকা লাগে না। মা কে বলতেই ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, তোর তো সবটাতেই হিংসা।

মাদ্রাজ যাবার ছ'মাসের মাথায় আমার ভাই ফেরে ডান পায়ে চারটা স্ক্রু নিয়ে। বাইক অ্যাক্সিডেন্ট। তিনমাস ক্রাচ দিয়ে হাঁটতে হবে। খুব ভালো একটা অভ্যাসও সাথে করে এনেছে। ফেন্সিডিল। বিকাল হলে পাগল হয়ে যায়। আমার মা রিক্সা দিয়ে ছেলেকে প্রতি বিকালে বন্ধুর বাসায় দিয়ে আসে।

- ব্যাটা মানুষ। সারাদিন এমুন কইরা বইয়া থাকতে পারে! যাক আড্ডা দিয়া আসুক।

মাকে অনেকভাবে বলতে চেষ্টা করি ভাইয়ার নেশার কথা। আমরা কথা সোহানের মা কেন শুনবে?

চার মাস পর ভাইয়া আবার মাদ্রাজ ফিরে যায়। চারমাসে ও বাঁশি বাজানো শিখেছে। আমাদের তিন বোনকে নিয়ে আমার মায়ের আদরের সোহান কতরাত গানের আসর বসিয়েছে এই চার মাসে তার ইয়ত্তা নেই। ভাইকে যে আমরাও ভালোবাসি সেটা মনে হয় দূরে গিয়ে ও টের পেয়েছে। পড়ালেখা করবে, আর বাইক চালাবে না, ফেন্সি খাবে না আমার মাথায় হাত রেখে শপথ করে যায় যাবার সময়।

দু'মাস পর আমাদের বংশের বাতি চিরতরে নিভে যায়। ড্রাঙ্ক অবস্থায় বাইক চালাতে গিয়ে লরির সাথে সরাসরি সংঘর্ষ মাদ্রাজের হাইওয়েতে। স্পট-ডেড।

এই ঝড়ে বাবাকে দরকার। বাবা এলো সব শেষ হবার পর। মাকে শান্ত কি আর করা যায়! চল্লিশ বছর বয়সে সোহানের পুনর্জন্মের আশায় গর্ভধারণ করে আপাত শান্ত হোন আমদের মা। তিনমাস দেশে থেকে বাবা আবার ফিরে যান। ঘর বাহির সব আমার হাতে। বন্ধুরা বলে, 'কী রে রিনা! তুই যে বয়সের আগে বুড়ি হয়ে গেলি!'

শেষ স্বস্তির সম্ভাবনাও মিটে যায় আমাদের আরেকটা বোন হওয়াতে।

- আল্লাহ তুমি এই ডাইনিগুলা'র মরণ দাও না কেন? আমার পোলারে খাইছে। এবার আমারে খাইবো।

মায়ের অসুস্থ চিৎকারে কুঁকড়ি মুকড়ি হয়ে থাকে ছোট বোন দুটো। পিচ্চিটা তো কিভাবে বেঁচে আছে সে এক বিস্ময়।

দিনা পাশের বাসার ইঞ্জিনীয়ার ছেলেটাকে বিয়ে করে একদিন পালিয়ে যায়। বীণাকে কলেজের হোস্টেলে দিয়ে দেই। বাবা চিঠি লেখেন,

- মা এবং ছোট বোন মিনা'র যত্ন নিও। তুমিই এখন একমাত্র ভরসা। মায়ের উপর রাগ কর না।

নিজের লেখাপড়া, মায়ের দেয়া মানসিক অত্যাচার, ছোটবোনদের দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমি খাবি খাই কূলহীন সাগরে।
বাবা তিন বছর পর একেবারে দেশে ফেরেন। মিনা'র বয়স তিন পুরলো। আমার মাস্টার্স প্রায় শেষের পথে।

- ওরে বিদায় কর। বিয়া দাও। না হয় দিনার মতো পলায়ে যাইতে কও। ওরা আমার পোলারে খাইছে। সোহান রে... ...

হ্যাঁ আমি পালিয়েছি। বাবার একাউন্টের সাইন জালিয়াতি করে মাত্র তিন লাখ টাকা নিয়ে নিউজিল্যান্ড চলে এসেছি। বহুদিন ধরে গোপনে গোপনে তৈরী হয়েছি। কারও পোলাকে খেতে নয়। শুধু নিজেকে বাঁচাতে।

এর চাইতে ভালো কিছু কি আমার করার ছিল? বীণার পড়ার খরচ আমি এখান থেকে পাঠাই। মিনা'র জন্যে আমার মন পুড়ে। বেচারা আমাকেই মা বলে জানে। কেমন থাকে, কী খায়- খুব খারাপ লাগে। আমি জানি আমি কখনো বংশের বাতি হতে পারবো না। তবে এটাও জানি মোমবাতি হয়ে পুড়ে যাবার জন্যেও আমার জন্ম নয়। এই যুগে আমি ইলেকট্রিক লাইটই হবো - এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নস্টালজিয়া

ঢাকা শহর খুব তাড়াতাড়ি উদোম হয়ে গেলো। হঠাৎ উদাস দুপুরে পবন বেশ টের পায়। কতো লেখকের লেখায় পড়া হরেক রকমের নির্জন দুপুর! সেই নীরব দুপুর এখন আর কোথাও বাসা বাঁধে না। দশ এগারো বছরে কত কিছু স্রেফ উবে গেলো!

পবনের অফিস ধানমন্ডিতে। এ না কি আবাসিক এলাকার চেহারা! পাশেই একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। কাজের ফাঁকে দোতলার জানালা দিয়ে তাকালে অনেকটাই চোখে পড়ে স্কুলের, বাচ্চাদের কাজকর্মের। স্কুলে কোন মাঠ নেই। এরা টিফিনের ফাঁকে কি করে? পবনের খুব জানতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে নিজের স্কুল লাইফের কথা। টিফিন পিরিয়ডে টেনিস বল দিয়ে মাঠে ফুটবল খেলা। দু'মাসে কেডস ছিঁড়ে ত্যান। বাসায় যথেচ্ছ বকুনি। নিজের মনেই হেসে কাজে মন ফেরায় পবন। খুব মনোযোগ দিয়ে 'বাংলিশ' জেনারেশনকে লক্ষ্য করা ওর কাজের ফাঁকে প্রধান বিনোদনে পরিণত হয়, নিজের অজান্তেই।

স্কুল ছুটির পর গাড়ির লাইন লেগে যায়। রাস্তা জুড়ে জ্যাম। ক্যাডাভেরাস অবস্থা। ও ধীরে আবিষ্কার করে এরা টিফিনে স্যান্ডউইচ, চিকেন রোল, ক্যান্ড কোক, চিপস ইত্যাদি ইত্যাদি খায়। পবনদের শৈশবে এসবের কোন চল ছিল না। দশ পয়সা দিলে মালাই পাওয়া যেতো। আট আনায় ঘুগনি। যেদিন বাবুয়ানা সেদিন ক্রীমরোল, বাটারবন। সারাদিনে একটাকা বাস ভাড়া, দুই টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে হাতে আরও দু'টাকা থাকতো। সেই টাকায় মাস শেষে তিন গোয়েন্দা, একটু বড় হলে মাসুদ রানা, কিশোর ক্ল্যাসিকের যথেচ্ছ কালেকশন বাড়ানো। নিজেদের গাড়িতে স্কুলে যাওয়া অনেক ভাবা স্বপ্নের একটা হয়ে ছিল।

এত মোটা কোন কোন বাচ্চা। এদের জীবনে কোন শান্ত বৈরাগ্যের দুপুর নেই পবন তা হলফ করে বলতে পারে। এরা কি দইওয়ালা হবার স্বপ্ন দেখবে কখনো? না। এসব বাচ্চাদের স্বপ্নের জগৎটা কেমন হয়? পবনের জানা নেই তবে অনুমান করে। ভীষণ রুটিনের কোন ভাবনাই হয়তো এদের সঙ্গী! তা নইলে কেন বাড়ছে এতো কিশোর অপরাধীর সংখ্যা! অথচ ও নিজে স্বাপ্নিক বলে আজো কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করে । এ-ও বুঝে ঘোরের ঐ আপাত অপছন্দেও (সকলের, ওর নিজের নয়) ভুবনটাই ওকে অন্যদের চেয়ে একটু হলেও ভিন্নতা দান করেছে।

আহ্! বাচ্চাটার হাত থেকে দামী আইসক্রীম পড়ে গেলো, ঝপাৎ করে। এমন এক দুপুর শেষে প্রায়-বিকেলে পবনের হাত থেকে উড়ে গিয়েছিল গ্যাস বেলুন। একবার নয়,দুবার। কি কষ্ট সেই ছোট্ট বুকে! ঐ বাচ্চাটারও কি তেমন কষ্ট হচ্ছে? না কি মাত্রাতিরিক্ত সচ্ছল মা কিনে দিবে আরেকটা আইসক্রিম! তুমি যা বপু, আর আইসক্রীম খেও না, নিঃশব্দে উচ্চারণ করে পবন। হাসিও পায়। ফার্মের মুরগির মতো জেনারেশন গড়ে উঠছে। দোষটা কার? এই বাচ্চাদের, না সময়ের? না কি এটাই যুগের চাহিদা? ও ঠিক বোঝে না। অথবা বুঝতে চায় না। পিঙ্ক ফ্লয়েডের "অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল" গানের ভিডিও চিত্রের মতো মেশিনে পড়ে ছাঁচে বের হওয়াই যেন সবার নিয়তি। এই যে পবনের নিজের সামনেই এখন সাতটা ফাইল। ও নিজেও তো পারছে না সব ঠেলে ভ্যানিলা আইসক্রীমের মতো শরতের আকাশটার নীচে গিয়ে দাঁড়াতে। বাচ্চাদের দোষ দিয়ে কী হবে? দুষ্টচক্র। জন্ম। পড়ালেখা, যাদের ভাগ্যে আছে। বাবার ট্যাকের জোর থাকলে পড়া তাড়াতাড়ি শেষ হবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বদৌলতে। অথবা পাবলিক ভার্সিটিতে ধুঁকতে হবে। তারপর চাকরি। বিয়ে। একটা কি দু'টা বাচ্চা। সংসারধর্ম। ঘরকন্না। এর মাঝে স্বপ্ন কই? তবুও পবন ভাবে, এই বাচ্চারা কি ফড়িং ধরে? ধ্যাৎ, ঢাকা শহরে ফড়িং আসবে কোত্থেকে? ক্যাপিটাল বার্ড হলো কাক, আর শালিক। কদিন পরে মশা ছাড়া আর কেউ থাকবে না, পোকা পাখি সব কিছুর প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে এই মশা।

সন্ধ্যাগুলো সোডিয়ামের অদ্ভূত আলোয় ফেণানো বিয়ারের কালার নিয়ে দাঁড়ায়। বিকেলের শেষে ধোঁয়ায়-ধূলোয় এমন ম্যাসাকার যে ওর মরে যাওয়া কবি মন প্রগাঢ় বেদনায় আরো বেশি ধূসর হয়ে যায়। যত্রতত্র 'দ্রুত খাদ্য'- ফাস্ট ফুড। শুধু গতি। সর্বত্র গতির চর্চা। কিন্তু কেন - কেউ জানে না। আগের সব ভালো, এখনকার সবকিছু খারাপ - নিজেকে এমন ভাইরাসেও আক্রান্ত মনে হয় মাঝে মাঝে। ওর কি তুলনা করার রোগ হয়ে গেলো? না কি ও সেই আগের মতোই খুব বেশি স্মৃতি কাতর? যে যার মতো। ও যেমন পারেনি জলি'র মতো হয়ে উঠতে। সবকিছুই তেমন। মিষ্টি কখনো ঝালের সাথে তুল্য হবে না।

স্কুলের পেছন দিকের বাউন্ডারিতে পবন একজোড়া কিশোর কিশোরীকে একদিন চুম্বনের স্বাদ নিতে দেখে। একটা ব্যাপারে অবশ্য আশ্বস্ত হওয়া গেল। 'আবেগ' এখনো ছুটি নেয়নি। পবন নিজের প্রথম চুমুর কথা ভাবে। তিনদিন ও তেমন কিছুই খেতে পারেনি, আশ্লেষে। এই বাচ্চাগুলোও কি 'ভুগবে' তেমন রোমাঞ্চে? 'আবেগ' তাহলে ভোগান্তি দেয়? তা না হলে ওর কেন মনে হলো 'ভুগবে রোমাঞ্চে' ?

ঐ যে একটা পাঙ্ক ছেলে, কানে দুল। এই বয়সটা পনেরো থেকে কুড়ি। পবনের নিজের কাঁধ ছাড়ানো চুল ছিল। পাঞ্জাবি। চশমা। শান্তিনিকেতনী ঝোলা। খর দুপুরে স্প্যানিশ গীটার হাতে টিএসসির চত্বর কাঁপানো। পিকস্ ইউজ না করে, ব্লেইড দিয়ে

গীটার বাজানো অনেককেই অবাক করতো। এখন ও সারাদিন কম্পিউটারের কী-বোর্ড বাজায়। একটা সময় একদিন গান না গাইলে-শুনলে নিজেকে মৃত মৃত লাগতো। এখন ক্বচিৎ ফুরসত মেলে গান শোনার। পবন জানে ওর আর কোনদিন কোথাও ফেরা হবে না। এই যুগে আর কোন কিশোর প্রিয়ার জন্যে বুক পকেটে করে জোনাক পোকা নিয়ে ঘুরবে না। বুক পকেটে কুটকুট করবে মোবাইলের আলো, মেসেজের বিপ। নস্টালজিক মানুষকে কে-ই বা ভালোবাসে! জলি তো ওকে বলতোই 'হোপলেস'। যে পকেটে জোনাক পোকা থাকতো সেই বুকটায় কফিনের শৈত্য ভরে দিলো একটামাত্র মানুষ । পবনের শুধু মনে হয় এই সিস্টেমটার কোথাও গোলমাল আছে। ছেলেবেলার সরল অংকের মতো, শেষ হতে হতে ও কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। শৃংখলা, ইংরেজি জানা,ও লেভেল, এ লেভেলে এদেশীয় বাচ্চাদের পারফরমেন্স সবকিছু ভালো। সব আছে, শুধু প্রাণ নেই। পরিমিত আলো, নিয়মের খাবার যেমন ফার্মের মুরগিকে গড়ে তোলে তেমনি এসব বাচ্চারা। আলোর হেরফের, একটু এদিক ওদিক হলেই ব্রয়লার লেয়ার শেষ। তেমনি এই বাচ্চাগুলোও একটু ঝাঁকি লাগলেই চিৎপটাং।

কী বাবা পবন, হিংসা হয় না কি ওদের? হিংসা না, দুঃখ হয়। নিজের ছেলেবেলা, তারুণ্য-এদের দেখাতে মন চায়।

পবন জানে এসব চিন্তার কোন ফল নেই। তাই সে একদিন ইশতিযাকের সাথে নিজের টেবিলটা বদলে নেয়। নতুন টেবিল থেকে স্কুলটা আর দেখা যায় না। আকাশও না। পবন জানতেও পারে না এবারের আকাশ কেমন কুলফি মালই এর মতো গলে গলে পড়েছে, শারদীয় শ্রাবণের সাথে।

বাতিল

সিঙ্গল লাইফ, বাবা-মা'র সংসারে;-যখন চাকরিজীবী

পৌনে সাতটা। অ্যালার্ম। প্রাতঃকৃত্য। গোসল। নাশতা। সাজ পোশাক। পৌনে আটটায় বাসের লাইন। চড়ারোদ। টিস্যু ভেজে। তুমুল বৃষ্টি। নিজে ভিজি। পৌনে নয়টায় অফিস কম্পাউন্ড। হাজিরা খাতায় দস্তখত। প্লাস্টিক সালাম। ইলাস্টিক হাসি। কুশল বিনিময়। ন'টা। স্ব-সিটে ঠেসে বসা। ইঁদুরমারা বিষের স্বাদ।
-একবার চেম্বারে আসুন।
-হ্যালো। অবশ্যই---নো নো, ইঁস্ মাই ডিউটি---এনি টাইম---ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম---থ্যাঙ্ক ইউ।
- বাচ্চাটার শ্বাসকষ্ট। উৎস পাশের টেবিল। 'মনে মনে আমার কী' ভেবে মনোযোগী হবার ভান করে কথা শুনে যাই।
-এগারোটার নাশতা, সঙ্গাড়া আপা। 'ওকে'।
-পার্টিরে স্যাংশনটা দিলেন না? ইমিডিয়েটলি দেন, বস হাঁকেন।
-আপনাকে আরো অ্যাফোর্ট দিতে হবে। বড্ড স্লো। সাবঅর্ডিনেটকে বলি।
-লাঞ্চে গেলাম।
-নামাজে আমার জন্য দোয়া করবেন।
-বসেন ভাই। আপনাকে ইনস্টুমেন্ট এখনই এনক্যাশ করে দিচ্ছি।
-শালা একটা মাক্ষিচুষ। হাড়ে হারামজাদা। টাকা নিতে পারছে, মাগার দিতে পারবো না।
-আর বইলেন না ভাই। লোনে কাজ কনরা জীবনটা জেরবার। সারাদিন মানুষরে খালি 'টাকা দেন, টাকা দ্যান' কইতে হয়।
-এসব ল্যাথার্জিক লোক নিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। আমূল পরিবর্তন দরকার।
-চলেন চলেন। গোছান। ছয়টা বাজে, বাড়ি ফিরতে হবে না?

বাসে ওঠা। বাড়িতে ফেরা। সন্ধ্যা সাতটা। গোসল। চা, নাশতা। পেপার। গল্পের বই। টিভিতে চিকাপঁচা অনুষ্ঠান। মাঝে মাঝে রান্নাঘর। গান শোনা। সাড়ে ন'টায় ডিনার। খুচরা টেলিফোন। হাতেগোণা অবশিষ্ট বন্ধুদের দুরালাপনীতে হি হি হা হা, দীর্ঘশ্বাস বিনিময়। ইন্টারনেটে নিজের গুরুত্ব খোঁজা, যদি ই-মেইল এসে থাকে তার ভিত্তিতে। টুকুর-টাকুর চ্যাট। বারোটায় বিছানায় ফেরত। শনি টু বুধ একই 'মেরি গো রাউন্ড'। বৃহস্পতি হাফ ডে। বিকাল থেকে ঘুমের আয়োজন। হঠাৎ আড্ডায় বেরোনো। শুক্রবার বাকি ছ'দিনের প্রস্তুতিতে জংধরা লোহা। প্রতিটা সপ্তাহ শেষ। নো দোল, নো হেল = হেলদোল।

ডাবল বেড, পায়রার খোপ, নিজের সংসার, দুজনেই যখর চাকরির দাস

-এহহে। আজকেও রুটি! বিরস মুখে গলাধঃকরণ। আগুন চা-গিলে দৌড়।
পৌনে ছ'টায় শয্যাত্যাগ। সকালের নাশতা । হট ক্যারিয়ারে আমার এবং তার লাঞ্চ সাজানো। কাকস্নান। সাতটা পনেরো। টেবিলে নাশতা। তাকে জাগানো। ঝট গোসল। সাড়ে সাতটা, নাশতা শষের তোড়জোড়। জানালা বন্ধ, জরজা লক। কল খোলা আছে কিনা টেস্ট করা। সুইচ অফ। দুজনে ঘরের দু গোছা চাবি নিয়ে পৌনে আটটায় আটশো স্কয়ার ফিটের ভাড়া খোপের ভেতর থেকে রাস্তায় ঝাঁপানো। অফিস, অফিস।
-যা জ্যাম ছিল।
-আর বলবেন না, স্রেফ অসহ্য।
-কোথ্থেকে কিনেছেন ড্রেসটা? ওমা! ড্রেসিডেল! কী সুন্দর!

মধ্যাহ্ন ভোজন। কী হলো লাস্টে কালকে 'কাহানি ঘর ঘর কি'-তে? আমি দেখতে পারিনি। কলিগের জিজ্ঞাসা।
-ওনাকে কী জিজ্ঞাসা করেন, উনি এসব দেখেন না। ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ!
স্মিত হেসে তাকিয়ে থাকি। প্রিয় বই-ই পড়তে পারি না, আবার সিরিয়াল! আল্লাহ মাফ করুক।

-কী আপা, চোখের নিচে কালি? নতুন বিয়ে, সাহেব গুমাতে দেয় না? হাহ্, হাহ্ শব্দে বিশ্রী হাসি গায়ে বিছা হাঁটার অনুভূতি সৃষ্টি করে। সেই মেনে নেয়া হাসিতে নীরব চাহনি দেই।

চারটা দশ। নারীস্কুলে গণজমায়েত। খুচরো কথার ঢেউ।

- জানি জানি কিভাবে প্রোমোশন পেয়েছে। ঢলানি সব।

- আপা, আমারও সমস্যা, আপনাদের ভাইয়েরও সমস্যা। আমাদের মনে হয় আর বাচ্চা হবে না।
সবার লোক দেখানো দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আদতে কারো কিছু যায় আসে না।
-পূর্বাচলে প্লট পেয়েছি।
-কিসের ছুটি নিলেন?
-রোগাদের সেক্স বেশি থাকে।
ক্লান্তিকর বাক্যধারা, দিনের পর দিন চলছেই, চলছেই।
পাশেই পুরুষ সহকর্মীদের কোলাহল।
-কী বেনসন? না ভাই, লিফ্ দেন।
-আজকে ঐ যে মোটা মাইয়াটা আইলো না, জিনিস দুইটা দেখছিলেন? উফ্...
-কী যে আপনি কন কায়সার ভাই! যেই পুঁচকিটা আজ ডলার এন্ডোর্স করাইলো ঐটার কাছে কিছুই না। তার ওপর ওড়না নাই।
-রেইন টিভি দেখছেন কাল রাইতে?
-মাইয়াডি বেশি বাড়ছে। পর্দা করে না।
-আপনার ভাবী তো একটুতেই ক্লান্ত। রেইন দেইখা আপনার ভাবীর লগে মজা পাই না।
-হামদর্দ খাওয়ান।

এভাবে সন্ধ্যা আসে। গৃহপালিত মানুষেরা ঘরে ফেরে। আমিও ফিরি। হাতে থাকে বাজার। রান্না। কোনদিন শাশুড়িকে দেখতে যাওয়া, কখনো নিজের মাকে। বরের বন্ধুদের, আত্মীয়দের বাসায় দাওয়াত রক্ষা। নিজেও বাসায় অন্যদের ভোজন করানো। রাতে 'তোমাকে দরকার' টাইপ স্পর্শের নিচে নিজেকে সঁপে দেই। এমন করেই চলে যাপিত জীবন। কোন উত্তেজনা নেই। আনন্দ নেই। আমার থাকা না থাকায় কোথাও কোন ছন্দপতন নেই।

শিহরণ চাই জীবনে। চাই এই জলো সময়ে একটু ত্রস্ত-বাস্তবতা। এই চিন্তায় ভীষণ ফালতু একটা কাজ করি। আমি আমাদের পাড়ার রফিক, যে আমাদের তারুণ্যে পৌঁছানোর কালে 'কুত্তা রফিক' নামে খ্যাত হয়ে যায় তাকে ভায়া হয়ে ভাড়া করি, আমাকেই মারার জন্য। আমার নিজের কাছেই ঘঁনাটা এতো অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকর লাগে যে, প্রথম প্রথম মনে হয় স্বপ্ন দেখেছি এমন একটা ব্যাপার ঘটানোর।

গত আঠারো দিন আমাকে ফলো করা চলছে, এটা দেখার পর নিশ্চিত হই, হ্যাঁ, আমি কুত্তা রফিককে আসলেই মার্ডারের ঠিকাটা দিয়েছি। পেশাদার খুনিদের চেহারা এতো সাদামাটা আমি ভাবতেই পারিনি। রফিক আগে যেমন ছিল এখনো দেখতে একই রকম। শুধু ওর নামের আগে 'কুত্তা' বিশেষণ যোগ হয়েছে, এই যা।

কন্ট্যাক্টটা পঁচিশ হাজার টাকার। লুকোচুরি খেলি। একদিন গাউসিয়ায় গিয়ে ফাঁকি দেই অনুসরণকারীকে। মজা লাগে। নতুন কিছু করার এক ধরণের ছেলেমানুষি উত্তেজনা মনের কোণে বাসা বাঁধে।
-কী আপা, আজকাল যেন বেশি খুশি! ব্যাপার কী? নতুন কোন খবর?

বেশিদিন আর এই অনর্থক আয়ু টেনে নেয়া নয়। ভাবতেই কেমন হালকা লাগে। মরার আগে নিজের ডেস্কের পেন্ডিং কাজগুলো গুছিয়ে যাবো-এ চিন্তায় কাজে আরো মনোযোগী হই।

আজকে পঁচিশতম দিন। কবে, কবে আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন?
উনত্রিশতম। অফিসে কুরিয়ারে একটা চিঠি এসেছে। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা- 'কেন আপনাকে মারার জন্য চুক্তি নিয়েছিলাম জানি না। আটাশটা দিন আপনার পেছনে ঘুরছি। কোন বেশকম তো পাই নাই। অফিস, বাসা,বর- এই তো আপনার জীবন। পরকীয়া নাই। ঝুট ঝামেলা নাই। এতো নিরীহ মেয়েমোনুষ মারতে হাত উঠলো না। সাবধানে থাইকেন। আপনাকে কিন্তুক মারার চেষ্টা চলতাছে।'

নাম-ধাম ছাড়া একটা চিঠি। কুত্তা রফিকও আমাকে মারেনি। মরার জন্যও আমি আনফিট। আত্মহত্যা করার সাহস নেই। কুত্তা রফিকের হাতে বাতিল হওয়া নিরীহ মেয়েমানুষ আবার টেনে যায় একই ঘানি-ডাবল খাট, ডাবল দাস...ওপর, নিচ সব সমান...অফিস...বাচ্চার ওয়াটার বটল...টু বি কন্টিনিউড...

যেদিন গেছে...

ভাবিনি এমন করে দেখা হবে...

ঢাকা শহরের পুরোটাই রাতে হলদেটে। সোডিয়াম বাতি গালে দেয় চুম। শাহবাগ থেকে রিক্শায় মিরপুর ফিরতে কেন যে নিউ মার্কেটের পথে এলো ওরা কে জানে! কিরণ সন্ধ্যাকে, সন্ধ্যা কিরণকে দোষারোপ করছে অজগরের মতো জ্যামের বহর দেখে। দু'জনেই বুঝতে পারে ভুল পথে আসা হয়েছে।

"তুই একবারও খেয়াল করবি না কুংফুকন্যা? শালীর শালী!' সন্ধ্যা কারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট। কিরণের স্কুল লাইফের বান্ধবী।
'তুই কেন খেয়াল করলি না?'-সন্ধ্যা কিরণকে জিজ্ঞেস করে।
'যা দোস্ত বাদ দে'- বলে সন্ধ্যা তর্কের পরিসমাপ্তি টানে।
রিক্শা ধানমন্ডি সাতাশ নম্বরের জ্যামে পাথর হয়ে দাঁড়ানো। হঠাৎ কানের কাছে 'Happy Friendship Day"।
'শিপলু-মৃদুল তোরা এখানে?'
এই তো Graphics এর একটা কাজ করতে এসেছিলাম।' মৃদুল হেসে উত্তর দেয়।
'এমন দিনে দেখা?' শিপলুর কথায় সবাই একচোট স্নিগ্ধ হাসি দেয়।
"নারে আজকে আর নামব না"বলে কিরণ-সন্ধ্যা বিদায় নেয়।
রিকশাওয়ালা মানিক মিয়া এভিনিউ তে এসে বললো সে আর যাবে না। গজগজ করতে করতে দু'বান্ধবী নামলো।
'ব্যাটা মিরপুর ১০নম্বর যাবে না আগে বলতে পারেনি? সাতটা বাজে কী যে করি!' কিরণ খুব ঠান্ডা মেজাজে সন্ধ্যার অভিযোগগুলো শুনতে থাকে।
'তুই দাঁড়া আমি রিকশা দেখি'কিরণ এই বলে ইতিউতি তাকাতে থাকে।
কিরণের পোশাক আর লম্বা চুল বাদ দিলে ওকে পেছন থেকে হাঁটা লক্ষ্য করলে কেউ মেয়ে বলবে না। দৌড়ঝাঁপ করে রিক্শা ও ঠিকই ঠিক করে ফেলবে। হলো ও তাই। পাঁচ পাঁচের শরীরে কোথাও মেয়েলী ঢেউটুকুও নেই। মুখটা হঠাৎ কৈশোরে পড়া বালকের মতো। সন্ধ্যা তার স্কার্ফ-বাঁধা মাথা হেলিয়ে বলে উঠলো, 'উফ্...তুই পারিসও হুজ্জোত করতে!'
কিরণ বললো, 'কি করবো, বাসায় ফিরতে হবে না?'
রিকশা কিরণের ইশারায় স্লো হলো। ও দুলকি ঘোড়ার মতো লাফ দিয়ে নামলো। চশমা ঠিক করে সংসদ ভবনের রাস্তায় চটপটির গাড়ির সামনে দাঁড়ানো মহুয়া-রোমানকে 'শুভ বন্ধু দিবস' বলে হেঁটে চলে এলো রিকশায়।
সন্ধ্যা বললো,' তুই এই আলোতে কিভাবে ওদের ট্রেস করলি?'
'আমার যে আত্মার বন্ধু, ভুলে গেলেও সব মনে রাখি। হাত নাড়িয়ে যেভাবে খাচ্ছিল তা দেখেই বুঝেছি ঐটা মহুয়া ছাড়া আর কেউ না। কী দিনেই না মোলাকাত! কিরণ থামতেই সন্ধ্যা হুঙ্কার ছাড়লো 'তুই কথা না বললে কী হতো?'
'বিশ্বাস কর দেড় বছর পর এভাবে দেখা হবে তাও এই দিনে কখনো ভাবিনি।' প্রত্যুত্তরে সন্ধ্যা ঠোঁট উল্টায়। তারপর দু'জনেই নীরব। যেন আজকের মতো সব কথা শেষ। কিরণ আঁধারে হাত আড়াল করে একটা সিগারেট ধরায়। সন্ধ্যা কিরণের ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করতে থাকে।
কিরণ এই মুহূর্তে ধোঁয়ায় নিজেকে আড়াল করে ভাবতে থাকে মহুয়ার টিপের রং, চুড়ি ইত্যাকার বস্তুগুলোর কথা। সন্ধ্যার কপাল বিরক্তিতে কুঁচকে আছে। ওর মনে ভাবনা চলে কিরণ মেয়েটা যে কবে স্বার্থপর হতে শিখবে?

ক্ষমা করে দিও আমায়...

আজকের এই 'আমিত্ব'র অনেকটা জুড়েই কিরণের অবদান তা মহুযা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। হলদেটে আলোয় দেখা কিরণ মজুমদারের সেই ম্লান মুখ কিছুতেই মহুয়া ভুলতে পারছে না। প্রথম সত্যিকারের বন্ধুত্ব, প্রথম ভালোবাসা, কত 'প্রথম' এর অনুভূতি যে ঐ মেয়েটার সাথে মহুয়ার! টিপ-চুড়ি খুলতে খুলতে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় মহুয়া নিজেকে দেখতে থাকে। এই যে বিশেষ মাদকতাময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গোটা গোটা চোখ-মুখ, ঝকঝকে দাঁত, ব্লাঙ্ক কাটের চুল,জলপাই এর মতো মসৃণ ত্বক এসব সে দারুণ ভালোবাসে। পুরুষ ছাড়া কে পারবে এই সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে! পুরুষ,পুরুষকার,পুরুষত্ব...শব্দ ক'টা মাথায় বেশ খেলে। মহুয়া ভাবতো ও পুরুষ ঘৃণা করে। তাই কিরণকে সে সেভাবেই...আদপে ছেলে ছাড়া ও নিজে অর্ধেক এটা দেরীতে হলেও বুঝতে পেরে সরে এসেছে ও কিরণের কাছ থেকে।

'রণো, আমার রণো, মাফ করে দিস আমায়। শুভ বন্ধুত্ব দিবস, ক্ষমা করিস আমায়' জপ করতে করতে মহুয়া ঘুমে ঢলে পড়ে ছোট ভাই এর সাথে ভাগাভাগি বিছানায়।

আমরা যাব যেখানে কোন মেয়ে যায়নি সাহস করে...

তানের ইদানীং ভীষণ স্কুল লাইফে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। কোন দুঃখে যে ঢাকা ছেড়ে এই খুলনায় পড়তে এলো! তানের হাতে কিরণের চিঠি "কবে আসছিস ঢাকায়? ডেট জানালে গজল্লার আয়োজন করি। কী চলবে ধুন, না লিকুইড? মাইরি দোস্ত বলিস না তুষার তোকে ওসব খেতে মানা করেছে..."।

ঢাকায় আগামী একমাসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। গজল্লা আর হয়েছে! কিরণ তুই এখনো চিঠি লিখিস? লেখাপড়া কি পুরোপুরিই ছেড়ে দিয়েছিস? তুই ছিলি আমাদের ছ'জনের মধ্যে সবচাইতে ব্রাইট। - চিঠি পড়তে পড়তে তান মনে মনে এসব উত্তর দিতে থাকে। কেমন আছে মহুয়া রিনি, সন্ধ্যা, মিলিরা? ঢাকা শহরে কি ওরা এখনো ঘণ্টায় রিকশায় ঘোরে? ওদের জন্যে কি গাড়ি থামে লিফ্ট চাইলে? স্মৃতিরা তানের বুকে ভীষণ ডানা ঝাঁপ্টায়। হোস্টেলের রুমমেট কতো আগেই ঘুম। ও কিরণকে লেখার জন্যে রাইটিং প্যাড- কলম টান দেয়।

'ঘুম আসছে না। কালকে সেমিস্টার ফাইনাল। তোদের মিস্ করি। তোর পত্র মানেই স্মৃতিতে করাঘাত। কেন 'এভাবে' লিখিস? আমি ঢাকাকে ভুলতে চাই। মন দিয়ে পড়া আর প্রেম করা- এই আমি আপাতত করতে চাই।'

এটুকু লিখে তান থামলো। ও বুঝে ফেলেছে এরপর সূক্ষ্ম অনুভূতির রণো মানে কিরণ ওকে আর কখনো চিঠি পাঠাবে না। যা বুঝার বুঝে নেবে। ওদের আর একসাথে অন্যকোন মেয়ে করেনি এমন দুঃসাহসী কাজ করা হয়ে উঠবে না।

যেতে যেতে পথে...

হালকা শীতের বিকেলটা এমন মারকুটে ঠান্ডায় রূপ নেকে রিনি স্বপ্নেও ভাবেনি। সালেহ ভার্সিটিতে আজকে কি করেছে তার বর্ণনা দিচ্ছে নিবিষ্টমনে। ঘণ্টার রিকশা দেখা গেল ঘুরতে ঘুরতে রণোদের বাসার কাছে। রিনি তাড়াতাড়ি রিকশা থামিয়ে সালেহ কে বসতে বলে রণোদের বাসায় ঢুকে পড়ে। 'কিরণ আপা বাসায় নেই'- কাজের মেয়ে বললেও রিনি রণোর রুমে গিয়ে একটা শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। রণোর সাথে যা খুশি করা যায়। সম্পর্কটা ভীষণ জটিল তবু কোথায় যেন সারল্যের তারল্য রয়েই গেছে। সালেহ মহুয়ার বড় ভাই, রণোর সাথে মহুযার সম্বন্ধ সামান্য ঘোরালো, আবার রিনিকে মহুয়া ভাবী হিসেবে মানতে নারাজ; এসব সমীকরণে বন্ধুত্ব ভেস্তে গেলেও ক্লাশ ফোর থেকে একসাথে পড়া কিরণের উপর ওর দাবি বেশী এটা রিনি সহজাত জ্ঞানেই বুঝতে পারে।
সালেহ'র ডাকে রিনি'র ঘোর ভাঙ্গে। "তুমি কিরণের বাসায় কেন গেলে? জানো না ঐ মেয়েটাকে আমি একদম পছন্দ করি না! স্মোক তো নরমাল, আরও কী কী করে আল্লাহ জানেন!"
রিনি এই সময় চুপ থাকাই ভালো ভাবে। মনে মনে হাসে পুরোটা পথ যেতে যেতে, 'শালা, সালেহ নিজে চেইন স্মোকার, শু-দ-ধু রণোর বেলায় যত দোষ, হাহ্ হাহ ।'

উপরে এই যে ছ'জন মেয়ের কথা বললাম তারা সবাই অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ওরা একসাথে মিলিত হয়েছে মিলি'র বিদায় উপলক্ষ্যে। মিলিরা সপরিবারে দেশ ছাড়ছে। মিলির বাসায় মহুয়া,রিনি, সন্ধ্যা, কিরণ, তান এসেছে। স্কুল ছাড়ার পর এইভাবে একসাথে হওয়া বহু, বহুদিন পর। ছাদের রুমটাতে শুধু ওরা ছ'জন। সারারাতের প্ল্যান। আকাশ ফেড়ে জোছনা আজ। খাওয়া সেরে সবাই ছাদে। আস্তে আস্তে আড়ষ্টতা কাটতে থাকে। মিলি, রণো একসাথে গেয়ে ওঠে 'পুরনো সেই দিনের কথা...' মহুয়া হুইস্কির বোতল খোলে, সিগারেট পুড়তে থাকে অগুণতি।

সোনালী জলে মুখ খোলে একে একে।
রোমানকে বিয়ে করব দেখিস I am serious মহুয়া বলেই চলে...
'অনিরুদ্ধকে আমি Ditch করব সন্ধ্যা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে...।
বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান এটাই একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, তুষারকে আমি ছাড়বো না'- তানের কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটে...।
ফিরে তো আসবো না, তবে তোদের অনেক মিস করবো-মিলি'র উচ্চারণে এতক্ষণের কোলাহলে নীরবতা নামে...।
তুই মেনে না নিলেও সালেহকে আমার বিয়ে করতেই হবে, We did it… … … বুঝলি মহুয়া, রিনি'র কথায় আবার রগড়, বল না, কোথায়, কিভাবে, কেমন লাগে...খুক্, খুক, খিক, হা হা।

মহুয়া কিরণকে ধাক্কা দেয়, 'তুই কিছু বল সুন্দরী- একাই থাকবো, আমার কেউ নেই, আমি বাবা একাই রবো এটাই আমার অ্যাম্বিশন...'

'গা, গান গা,' একটা বাসার চিলেকোঠা ছ'জন প্রা-য় নারীর বহু কথার স্বাক্ষী হয়ে থাকে সেই রাত, ভোরের কুসুম আলোয় সমস্বরে সবাই বলে ওঠে, আবার দেখা হবে এখনই শেষ দেখা নয়।

পুনশ্চঃ হয়তো কিরণ চলনে বলনে মেয়ে হয়েছিল, কিংবা হয়নি, সন্ধ্যা অনিরুদ্ধকে ছাড়তেও পারে এর মধ্যে, মিলিরা ফিরেছে অথবা ফেরেনি। অনেক কিছুই ঘটা সম্ভব বিচিত্র পৃথিবীতে। তবে তাতে তো আর জীবনের চলমানতা থামে না! ওদের আয়ু বয়ে যায় নিজস্ব গতিতে, ভবিষ্যৎকে জায়গা করে দিয়ে।